ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-I, September, 2025, Page No. 190-195
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.01W.203

‘ঠাকুরমার ঝুলি’ (১৯০৭): রূপকথা ও শাশ্বত, আখ্যান কৌশলের আধুনিক বুনন

সমরজিৎ শর্মা, *গবেষক, ভারতীয় তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর, অসম, ভারত*

Received: 22.08.2025; Accepted: 22.09.2025; Available online: 30.09.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

"Thakurmar Jhuli" is a popular collection of fairy tales in Bengali children's literature. The compiler of this book is Dakshinaranjan Mitra Majumdar. Dakshinaranjan Mitra Majumdar had collected the fairy tales from various rural areas of the then greater Mymensingh district. Although the tales were collected, they became entertaining for children due to Dakshinaranjan's writing style. Rabindranath Tagore, in the preface of Thakurmar Jhuli, mentioned that there was an urgent need to revive Bengali folklore, as at that time, the only literature available to readers was European fairy tales and their translations. He expressed the necessity for an indigenous or native folklore that would remind the people of Bengal of their rich oral traditions. This would serve as a method of fighting against British cultural imperialism.

In the introduction to Thakurmar Jhuli, Dakshinaranjan described his memories of hearing fairy tales from his mother and aunt. Dakshinaranjan's aunt, Rajlaxmi Devi, had assigned him the responsibility of touring villages in their zamindari. He would travel and listen to Bengali folktales and fairy tales narrated by the elders of the villages. Most of these folk stories were collected from the Mymensingh district area of Bangladesh. He recorded these tales with a phonograph, which he carried, and absorbed the style by repeatedly listening to the recordings. However, he initially could not find a publisher and set up a press for self-publishing the first book, which would be a compilation of stories created from the recorded tales. At that time, Dinesh Chandra Sen, impressed by the manuscript, arranged for its publication through the renowned publisher Bhattacharya and Sons. Within a week, three thousand copies were sold. Several illustrations for the collection were also drawn by the author. These drawings were converted into lithographs for printing.

Keywords: Folk culture, Rituals, Belief, Folktales, Popular, Language, Tradition

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের ‘ঠাকুরমার ঝুলি’ (১৯০৭) সাহিত্যে রূপকথার প্রামাণ্য দলিল। শাশ্বত ও চিরন্তন রচনায় সকলের কাছে আজীবন স্মরণীয় গ্রন্থ। ঠাকুরমার ঝুলি বাংলা ভাষার সবচেয়ে জনপ্রিয় রূপকথার বই। বাঙালি পাঠকের কাছে রূপকথা আর ‘ঠাকুরমার ঝুলি’ প্রায় সমার্থক হয়ে গেছে। এই বইটির কথা জানেন না বা এসব রূপকথার সঙ্গে পরিচয় নেই এমন বাঙালি পাঠক খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। রবীন্দ্রনাথের মতে, ‘ঠাকুরমার ঝুলি’র মতো এত বড় স্বদেশী জিনিস আমাদের দেশে আর কি আছে? কেননা মাটি ও মানুষের ঐতিহ্যিক চেতন মনকে তিনি এতে তুলির বুননে চিত্রায়িত করেছেন। এগুলি এত নিপুণ যেখানে দক্ষিণারঞ্জন মিত্র যেন ‘রসের রাজা’ হয়ে বসে আছেন। তাঁর আগ্রহ,

ধৈর্য, পরিবেশন রীতি, দায়িত্বশীলতা সবকিছু নতুনভাবে গড়ে উঠেছে আর 'ঠাকুমার ঝুলি' তাতে হয়ে উঠেছে আমাদের চিরায়ত চিরকালীন সম্পদ।

এই গ্রন্থে কাহিনির সাহিত্যিক মূল্য একটু ভেবে দেখা দরকার। গল্পগুলোয় এমন ডিটেইল প্রচুর আছে, যা ঠিক গল্পের জন্য অনিবার্য ছিল না। মিথের প্রচলিত ছাঁচের সঙ্গে এটা আর একটা বড় তফাৎ। এটা বুঝতে গেলে একটু ক্লথ লেভি স্ত্রসের কথা শোনা দরকার। তাঁর মতে,

> "মিথের পৌরাণিক মূল্য জঘন্যতম অনুবাদের পরও সংরক্ষিত থেকে যায়। যেখানে উদ্ভূত হয়েছে সেখানকার লোকজনের ভাষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতা যেমনই হোক না কেন একটি মিথ তা সত্ত্বেও পৃথিবীর যেকোনো স্থানের যেকোনো পাঠকের কাছেই মিথ হিসেবেই উপলব্ধ হয়। মিথের সারবত্তা কখনোই এর স্টাইল, এর মৌলিক সুর বা এর বাক্যরীতির মধ্যে নিহিত থাকে না, বরং যে গল্পটা এখানে বলা হয় সেটাই এর সারবত্তা।"[১]

এই কথাগুলি অনেক দূর পর্যন্ত 'ঠাকুরমার ঝুলি'র ক্ষেত্রে খাটবে কিন্তু একেবারে পুরোপুরি খাটবে না। ফলে গল্পগুলি কীভাবে পড়ব তার কৌশল জানা দরকার।

প্রাসঙ্গিকভাবে রবীন্দ্রনাথকে উদ্ধৃত করে বলা যায়,

> "দক্ষিণাবাবুকে ধন্য! তিনি ঠাকুরমার মুখের কথাকে ছাপার অক্ষরে তুলিয়া পুঁতিয়াছেন, তবু তাহার পাতাগুলি প্রায় তেমন সবুজ, তেমনি তাজাই রইয়াছে; রূপকথার সেই বিশেষ ভাষা, বিশেষ রীতি, তাহার সেই প্রাচীন সরলতাটুকু তিনি যে একটা দূর রক্ষা করিতে পারিয়াছেন, ইহাতে তাহার সূক্ষ্ম রসবোধ ও স্বাভাবিক কলানৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে।"[২]

এটি ধ্রুব সত্য কথা, চিরন্তন।

বঙ্গীয় ১৩৮৪ সনে 'এক্ষণ' পত্রিকায় তৃতীয় চতুর্থ সংখ্যার ফরাসি পন্ডিত ফ্রাঁস ভট্টাচার্যের একটি রচনার অনুবাদ প্রকাশিত হয় 'ঠাকুরমার ও ঠাকুরদাদার ঝুলি: একটি পাঠ' শিরোনামে। মূল লেখাটি ফরাসি থেকে অনুবাদ করেছিলেন লোকনাথ ভট্টাচার্য। এযাবৎ 'ঠাকুরমার ঝুলি' (১৯০৭) নিয়ে আলোচনা, সমালোচনা, তর্ক-বিতর্ক ইত্যাদি নিয়ে কম হয়নি। তবে ফ্রাঁসের লেখা বিশেষ মনোযোগের দাবি রাখে কারণ এই লেখাটি পাঠের একটি রীতিমতো নিয়ম-নিষ্ঠ পদ্ধতি ভাঙার চেষ্টা করেছেন। শ্রীমতি ফ্রাঁসের পিএইচ.ডির বিষয় ছিল 'বাংলা রূপকথা'। এই লেখার মধ্যে ফ্রাঁস ঠাকুরমার ঝুলির রূপকথাগুলোকে বিভক্ত করেছেন ভ্লাদিমির প্রপের পদ্ধতি অনুসারে, কর্মের ধারাবাহিকতা অনুসারে। কর্মের ধারাবাহিকতা বলতে বোঝানো হয়েছে পরম্পরা। প্রপ মনে করেন, মিথ বা রূপকথা পাঠ করতে হবে ন্যারেশনের মধ্যে পাত্রপাত্রীর ক্রিয়ার যে পরম্পর আছে সেই পরম্পরা অনুসরণে অর্থাৎ পরম্পরার মধ্যে কোনটির পর কোনটি আসছে বা কোন পরম্পরাকে অন্য একটি পরম্পরা অনুসরণ করছে।

মিথলজি এবং ফোক কোনো দেশের শিকড়কে বুঝতে সাহায্য করে। 'ঠাকুরমার ঝুলি'তে রূপকথার সঙ্গে মিথের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়। পাঠকের বুঝতে অসুবিধা নেই 'ঠাকুরমার ঝুলি'(১৯০৭) বাংলা রূপকথার জগতে মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

ঠাকুরমার ঝুলি রূপকথার শারীরিক কাঠামো নিয়ে বিচার করতে গিয়ে একটি ছকের প্রস্তাব দিয়েছেন শ্রীমতি ভট্টাচার্য। তিনি কখনো বলেননি, ঠাকুরমার ঝুলি গল্পটি সব কাঠামোর মধ্যে পড়বে। তিনি আরও বলেন, এক শ্রেণির কাহিনিতে নারীর বন্ধ্যাত্বকে এক প্রাথমিক পরিস্থিতি হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এই ধরনের কাহিনির পরিস্থিতি হয় অভাব বনাম নিরসন। তাহলে, সেই হিসেবে দেখতে গেলে বন্ধ্যাত্ব নামক যে অভাব নিয়ে কাহিনির সূত্রপাত হয় তার নিরসনের জন্য নায়ককে একটি নির্দিষ্ট কর্মপ্রণালীর মধ্যে দিয়ে পদক্ষেপ নিতে হবে, তবে এসব ক্ষেত্রে কাহিনি যথার্থভাবে শুরু হয় তখনই যখন বন্ধ্যাত্ব নামক অভাব সযত্ন চেষ্টায় একবার দূরীকৃত হওয়া সত্ত্বেও কোনো দুষ্কর্মের ফলে অভীষ্টের (যা এক্ষেত্রে সন্তান) প্রাপ্তি দাঁড়ায় গিয়ে আধা প্রাপ্তিতে; সেই আধাপ্রাপ্তি সম্পূর্ণ প্রাপ্তিতে পরিণত হবে একেবারে গল্পের সমাপ্তিতে তার আগে নয়। প্রসঙ্গক্রমে এসে যায় 'দুষ্কর্ম বনাম দুষ্কর্মের ক্ষতিপূরণ' এর কথা সেই সঙ্গে 'অভাব বনাম অভাবের নিরসন' পরিকল্পনা আমাদের মাঝখানে এসে মাথা গলায়।

তবে, কাঠামো বিচারের ক্ষেত্রে শ্রীমতি ফ্রাঁসের পদ্ধতি আমরা মোটামুটি ঠিক বলে ধরেই নিচ্ছি। এক্ষেত্রে ভ্লাদিমির প্রপের 'রূপতত্ত্ব' (Morphology) এবং লেভি স্ত্রসের 'কাঠামোবাদ' (Structure) তত্ত্বের সাজুয্য লক্ষ্য করা যায়।

প্রপের তত্ত্বের মূল কথা হচ্ছে, লোককথা বা পরিকথায় ঘটনাগুলো একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ক্রমে মেনে চলে। এই পর্যায়ক্রম বা ফাংশন প্রপের মধ্যে ধ্রুব। শুধু গল্পের চরিত্রগুলো পাল্টে যায়। তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের পুরাণ বা রূপকথার মধ্যে সাদৃশ্য দেখে ঠিক করেছিলেন যে, মানুষের মনের ভিতর একটি সামান্য লজিক্যাল স্ট্রাকচার আছে। অতীতে একটি মিথ আছে, আদিম মানুষ যেভাবে প্রকৃতি ও সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব ব্যাখ্যা করতে চেয়েছে মিথগুলি সেসবেরই প্রতিফলন।

ভাদিমির প্রপ ও লেভি স্ত্রসের দুজনেরই কাজের পদ্ধতি আলাদা। এঁদের বুঝতে গেলে ফার্দিনান্দ দ্য সেস্যুর তাঁর ভাষাতত্ত্ব আলোচনায় লাঙ (Langue) ও বাচন (Parole) এর প্রসঙ্গে চলে আসে। প্রপ গ্রহণ করেছিলেন ক্রমিক বিবর্তন পন্থা বা মিথ গঠনের ডায়াক্রনিক (Diachronic) ধরণ এবং সেস্যুর যাকে ভাষার ক্ষেত্রে নাম দিয়েছেন, যার সঙ্গে পারোলের সাদৃশ্যপূর্ণ। এখানে মিথকে ঐতিহাসিকভাবে পাঠ করা হয়। এই পদ্ধতিতে ন্যারেশনকে গ্রহণ করা হয় গল্পের কাল-পরম্পরার কঠোর অনুসরণে, মিথের উপকরণগুলিও এখানে এসে অপ্রত্যাবর্তযোগ্য পারম্পর্য হিসেবে। প্রপ মনে করে, একটি পাঠের (Text) কাঠামো তৈরি হয় ন্যারেটিভ ইউনিটের (যাকে তিনি বলছেন ফাংশন বা ক্রিয়া) একটি ক্রমিক বিবর্তনমূলক শৃঙ্খলার মাধ্যমে।

অন্যদিকে লেভি স্ত্রসের পদ্ধতি স্থানানুক্রনিক (Synchronic), যা ভাষাতন্ত্র (Langue) এর সঙ্গে সাদৃশ্য। এই ধরণটি অনৈতিহাসিক। ন্যারেশনের ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে যেসব পুনরাবর্তনমূলক বিন্যাস চোখে পড়ে সেগুলিকে নজর করাই এই পদ্ধতির প্রবণতা। একটি পুনরাবৃত্তিমূলক বিন্যাসের কতগুলো নির্দেশনকে অন্য কতগুলো বিন্যাসের সঙ্গে মিলিয়ে পাঠ করলে আমরা একটা ধারণা পেতে পারি যে কীভাবে মানব চিত্ত বাইনারি অপজিশনের প্রক্রিয়াতে কাজ করে। লেভি স্ত্রস ন্যারেটিভকে ভেঙে নিয়েছেন কতগুলি আলাদা গঠনে যা তাঁর মতে, মিথের বেসিক ইউনিট। এই ইউনিটের নাম মিথেম। মিথের পরমার্থ বুঝতে তিনি এই মিথেমগুলোকে একটি প্রতিকল্প স্থাপনমূলক ম্যাট্রিক্সের মধ্যে সাজিয়েছেন।

মনে রাখা বাঞ্ছনীয় 'ঠাকুরমার ঝুলি' (১৯০৭) সংগ্রহ করাটা কিংবা প্রকাশ করাটা আর অন্য সব সাহিত্যের মতো নয়। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র কোনো পথ চলতি কৃত্রিম কিছু আরোপ করেনি। এমনকি মনের মাধুরীও মেশাননি। নিজের মনে যদি কিছু একটা করার থাকে তার প্রয়োগও ঘটাননি। মায়ামমতা ভরা মনটাকে ঠাকুরমার কাছে স্বনিয়মের কোঠায় বেঁধে রেখেছেন লাগানছাড়া করেননি। কি সংযম ছিল তার! বুঝতে পারেন এবং সে ভার কার্যকর করেন, নিয়ন্ত্রিত হন। দায়বদ্ধতার মূলে সমাচ্ছন্ন থাকেন প্রণম্য দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারকে। তাঁর এই কাজ আমাদের মনের মনিকোঠায় হয়ে থাকবে স্বপরিচয়, আত্মানুসন্ধানজ্ঞাপক। এখানে লোককথা, রূপকথা, উপকথা, পুরাণ, ইতিহাস এক একটি জীবনে প্রামান্য দলিল, শাশ্বত ও চিরন্তন। বিভিন্ন উপাদান ও মোটিফের মধ্য দিয়ে আমাদের ঐক্য যূথরুদ্ধ সামষ্টিক এষণা এতে পথ করে নেয় পুনরুদ্ধারও পায়।

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার স্বয়ং ঠাকুরমার ঝুলির গল্পগুলোকে কয়েকটি শ্রেণিতে ভেঙে নিয়েছেন এগুলি হল- 'দুধের সাগর', 'রূপতরাসী', 'চ্যাং-ব্যাং', 'আম সন্দেশ'। প্রধানত রূপকথা ও উপকথা এবং উপকথার পর্যায়ভূক্ত রচনা। এর মধ্যে 'দুধের সাগর' ও 'রূপতরাসী' পর্বের দশটি গল্প রূপকথামূলক। 'কলাবতী রাজকন্যা', 'ঘুমন্তপরী', 'কাঁকন-মালা', 'কাঞ্চন-মালা', 'সাতভাই চম্পা', 'শীত বসন্ত' এবং 'কিরণ-মালা' সজ্জিত ঠাকুরমার ঝুলি। 'রূপতরাসী' পর্বে আছে 'নীলকমল আর লালকমল', 'ডালিম কুমার', 'পাতাল কন্যা', 'মণিমালা', 'সোনার কাঠি রুপার কাঠি'। প্রাসঙ্গিকভাবে বলা যায়, ইংরেজি 'Fairy Tales' আর বাংলার 'রূপকথা'এক নয়। 'Fairy' বা 'পরী' ঠাকুরমার ঝুলিতে নেই।

বাংলার রূপকথা গল্পকে এমনভাবে হতে হবে যেখানে পরীদের ভূমিকা সামান্য হলেও ঠিক আছে কিন্তু প্রধান হবে না। গল্পগুলো কোনো দেবদেবীর মাহাত্ম প্রচারের বাহন হবে না, সেখানে ইতিহাসের কোনো চরিত্র নায়ক হয়ে উঠবে না। রূপকথার গল্পে ভূতপ্রেত বা পশুপক্ষীর উপস্থিতি থাকলেও তারা গল্পের নিয়ন্তা হবে না। এমনকি যে সমস্ত পশুপক্ষী থাকবে তারা অপ্রাকৃত হবে যেমন রাক্ষস-রাক্ষসী, পক্ষীরাজ, বেঙ্গমা-বেঙ্গমী, খোক্কস, শুকসারী ইত্যাদি। সব কিছুর উর্ধ্বে থাকবে মানুষের প্রাধান্য কিন্তু বাস্তব পরিচয় থাকবে না। গল্পগুলিতে যেসব দেশের উল্লেখ থাকবে সে সম্বন্ধে পাঠকের কৌতুহল থাকবে না। রূপকথার গল্পগুলিতে প্রধান উপজীব্য বিষয় হচ্ছে নরনারীর ভালোবাসা এবং নিয়তি বা অদৃষ্ট। এই ধরণের গল্পগুলিকে অবশ্যই মিলনাত্মক হতে হবে এবং এতে শেষ পর্যন্ত সত্যেরও জয় হবে।

সেখানে দুষ্টের পরাজয় ঘটবে। প্রাচীন লোকবিশ্বাস বা ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে। কিন্তু কোনো নীতি বা উপদেশ প্রদানের মধ্য দিয়ে শেষ হবে না।

রূপকথা কিংবা লোককথা (Folk Tale) মিশ্রিত গল্পগুলিতে কৌতুক রস থাকবে না। ভাষা হবে কাব্যধর্মী সেখানে সরল, গ্রামীণ, স্নিগ্ধ গদ্যের ঘটনাবলি বর্ণিত হবে। এই গল্পে প্লটের নির্মাণও চমৎকার। এরকম কয়েকটি গল্প আছে যেখানে আমরা একাধিক প্লট খুঁজে পাই অর্থাৎ সরল কাঠামো এবং চরিত্রগুলির মধ্যে আন্ত:সম্পর্কের ভিত্তিতে একটি প্লট নির্মাণ করা যায়। আবার সেগুলির পাশাপাশি প্লটের আরো একটি সম্পূর্ণ বৃত্ত পাওয়া যায় আর একটি গল্পে দুটি প্লট থাকে এদের নিবিড় সম্পর্ক। যেহেতু দুটি প্লট পাচ্ছি আমরা সেজন্য স্বতন্ত্রভাবে দুটি গল্প হিসেবে পাঠ করা যায় তেমনি দুটি প্লটের গভীর বন্ধনের ফলে একটি সম্পূর্ণ গল্প হিসেবে পাঠ করা যায়। এই গ্রন্থে এরকম জটিল প্লটের দৃষ্টান্ত হল 'শীত বসন্ত', 'নীলকমল আর লালকমল', 'ডালিমকুমার'।

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার 'ঠাকুরমার ঝুলি' (১৯০৭) গল্পকে যে কয়েকটি শ্রেণিতে ভেঙে নিয়েছেন 'দুধের সাগর', 'রূপ-তরাসী', 'চ্যাং-ব্যাং', 'আম-সন্দেশ' ইত্যাদি। এগুলির প্রথম তিনটিতে শ্রেণিকরণ বিন্যাসের টের পাওয়া যায়। দুধের সাগর প্লটে ভূত-প্রেত রাক্ষস একেবারেই অনুপস্থিত। এখানে অতি প্রাকৃত চরিত্র নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু রাক্ষস-খোক্কসের যে অতিচেনা রূপকথা জগৎ তার কোনো ছায়াই নেই। বরং লক্ষ করা যায়, মানুষকে ভূত-প্রেত হিসেবে (যেমন কিরণমালা গল্পের ছোট্ট রানী)। আবার রূপ-তরাসী ভাগের সব গল্পগুলো অতিপ্রাকৃত।
গ্রন্থটিতে লক্ষ্য করা যায়-

- "রাজ সিংহাসন ফেলিয়া শীত উঠিয়া দেখেন, -- মা! বসন্ত উঠিয়া দেখেন মা, --- মা! সুয়োরানীর ছেলেরা দেখেন,--- এই তাহাদের দুয়ো-মা! সকলে পড়িতে পড়িতে ছুটিয়ে আসিলেন। . . ."[৩]
- "পুরী র্থ র্থ কাঁপে! হাতের তরোয়াল ঝন ঝন--রাজপুত্র হাকিলেন--জানি না, যে হও তুমি, রক্ষ রক্ষ দানব! যদি রাজপুত্র হই, যদি নিষ্পাপ শরীর হয়, দৃষ্টির আড়ালে তরোয়াল ঘুরাইলাম, এই তরোয়াল তোমাকে ছাঁইবে!"[৪]

উপরোক্ত উদ্ধৃতিগুলিতে রূপকথা ও লোককথায় অকল্যাণ ও অমঙ্গলের শক্তির বিপরীতে শুভ চেতনা জয়ী হয়। এর পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে রোমাঞ্চ মুহূর্ত। একটু গভীরভাবে ভাবলে দেখা যাবে, রোমাঞ্চের ভেতরে দেখা যায় রাক্ষস-খোক্কসের সব অপকৌশল ধরা পড়ে গেছে। এর পরতে লক্ষ্য করা যায় বেঙ্গমা-বেঙ্গমী বা ভূত-পেত্নীর রহস্যও উন্মোচিত হয়েছে। এইসব প্রতীকী ঘটনা প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে সঙ্গতিসূচক। দৈনন্দিন জীবনযাপনে আমাদের নানাক্ষেত্রে যে কৌশলী ভূমিকা বা শ্রেষ্ঠত্বের যে বলিহারী আকাঙ্ক্ষা তা রূপকথার গল্পে বা কৌশলগত ফ্লেমে কিংবা সর্বদৈশিক রূপকথার কাহিনি ঐক্যে অনেকটা মিলে যায় মেলবন্ধনও রচনা করে।

অতীতে ছিল এবং বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় দেখা যায় মন্ত্র বা জাদু বলে কোনো নারী যদি বিপদে পড়ে প্রধানত পুরুষরাই এগিয়ে এসেছে সেজন্য পুরুষের প্রাধান্য বা কৃতিত্ব বেশি। এমনকি নারীরাও পছন্দ করে তারা বিপদে পড়লে পুরুষরাই উদ্ধার করুক এটাই তাদের কর্তব্য। প্রকারান্তরে পুরুষে আস্থা নারীদের। প্রচলিত আছে যে, নারীদের সহযোগিতা করলে পুরুষের বল বৃদ্ধি কিংবা সামাজিক মর্যাদা সাবলীল থাকে। তাছাড়া নারীর লৈঙ্গিক ব্যাপারটি তো আছেই। র‍্যাডিক্যাল নারীবাদী সুলামিথ ফায়ারস্টোনকে এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করা যায়। কারণ লিঙ্গিয় স্তরায়নই নারীর শ্রেণি ও সমাজের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করে।

'কাঞ্চনমালা', 'সাতভাই চম্পা', 'কিরণমালা', 'মণিমালা', 'কলাবতী রাজকন্যা', 'কাঁকনমালা' এরা সব শৌখিন উচ্চতার রমনী। কালের প্রবাহে চিরায়ত বা আবহমান ঐতিহ্যে তারা এক কৃষ্টিতে গড়া। ঠাকুরমার ঝুলি গল্পে প্রায় সবগুলি নারী প্রধান চরিত্র। এখানে নারীর অসহায়ের কথা যেমন ফুটে উঠেছে তেমনি প্রকাশ পেয়েছে তাদের ঐতিহ্য। তবে পুরুষ তাতে একপ্রকার কর্তৃত্ব প্রবণ, বলশালী এবং আধিপত্যবাদী। সেখানে নারীরাও নারীরা তা মান্য জ্ঞান করেছে। পুরুষ মূল্যবোধের কোথায় এর গুরুত্ব? পুরুষ অসহায় নারীকে উদ্ধার করতে এসেছে। কখনো কখনো এও লক্ষ্য করা যায় পুরুষ কখনো শোষকও বটে! পুরুষদের চোখেই নারীর অভিজ্ঞতাও সমাজে বিচার্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেভাবেই তারা সমাজে বা গল্পে প্রতিষ্ঠিত। ফলে তাদের লিঙ্গ মর্যাদাও ওই মাপে পুনর্গঠিত।

ফায়ারস্টোনের তত্ত্বও সেই কথা বলে। ঠাকুরমার ঝুলিতে অলৌকিক শক্তি বা অতিপ্রাকৃত শক্তিও নারী পুরুষ মনস্তত্ত্বের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে। নারী ও পুরুষ উভয়ই অলৌকিক শক্তি দ্বারা প্রভাবাচ্ছন্ন। এগুলি অনেকটা টোটোমিক

মিথের মতো অন্তর্লীনও বটে। রাক্ষস-খোক্কস থেকে শুরু করে নানা অবাস্তব প্রবণতা এ মিথের অন্তর্ভূক্ত, প্রশ্রয়ভূক্তও বটে।

প্রাসঙ্গিকভাবে বাখতিনের 'কার্নিভালাইজেশন'এর কথা বলা যেতে পারে কেননা কার্নিভাল হল এমন এক উৎসব যা পবিত্র অপবিত্র, বিশিষ্ট তুচ্ছ, জ্ঞানী মূর্খ সবাইকে একত্রিত, ঐক্যবদ্ধ ও সম্মিলিত করে গড়ে তোলে জনসাধারণের যৌথ ক্রিয়াকলাপ। জীবনের সতীব্র প্রকাশই হল কার্নিভালের জীবন। এই সময় জনসাধারণের মধ্যে সবরকম দূরত্ব লুপ্ত হয়ে যায়, এখানে উচ্চতর রমণীর কথা আছে আবার নিম্নতর রমনীর কথা আছে যারা সমাজে এক অর্থে পিছিয়ে পড়া অর্থাৎ প্রান্তিক। এই প্রান্তিক নারীদের মধ্যে স্বাধীন, অবাধ ও অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। গল্পে প্রান্তিক নারীদের মধ্যে এইসব কিছুই লক্ষ্য করা যাচ্ছে এবং তাদের প্রতিটি কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেছে আখ্যানের বহুস্তরের বয়ান। এই প্রসঙ্গে বাখতিনের 'পলিফোনি'র কথা চলে আসে কেননা 'পলি' অর্থাৎ বহু, 'ফোনি'-র উৎসে আছে ধ্বনি বা স্বর। অর্থাৎ গল্প বা উপন্যাস বহুস্বরসঙ্গতিমূলক শিল্প যেখানে বহু স্বাধীন এবং অমিশ্রিত কণ্ঠস্বরের সমাহার ঘটে এবং প্রতিটি কণ্ঠস্বরই উপন্যাসের এক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ অংশ। উপন্যাস বা গল্পের ভাষা স্থানীয় ভাষায় হয় সেটা জটিল বা সরল হতে পারে কিন্তু কবিতার ভাষা সব সময় সরল ভাষায় হয় কেননা কবি সবসময় নিজের ভাষায় সহজ সরল ভাবে উপস্থাপন করেন।

আবার প্রাসঙ্গিকভাবে 'ডেকামেরন', 'ক্যান্টারবেরি টেলস', 'জাতক', 'আরব্য রজনী'তেও কার্নিভাল, পলিফোনি এবং আখ্যান কৌশল ভীষণভাবে প্রযোজ্য। এইসব গল্প বা উপন্যাসের ভাষা সহজ সরল আবার কখনো কখনো জটিলও লক্ষ্য করা যায়। ঠাকুরমার ঝুলি কিংবা এইসব গল্পের মধ্যে শাশ্বত রূপকথা লক্ষ্য করা যায়। মজার বিষয়, এইসব গল্পের মধ্যে রূপকথা নিয়ে গল্প অনবরত চলতেই আছে। বিভিন্ন কথক বিভিন্ন রকমভাবে গল্প বলছেন বিভিন্ন বিষয় নিয়ে, গল্পের ভিতর বিভিন্ন আখ্যান কৌশল (Narrative Technique) তৈরি হচ্ছে। প্রতিটি গল্পের সঙ্গে একটা যোগসূত্র থাকছে অর্থাৎ অন্তরপাঠশৃঙখল (Intertextuality) লক্ষ্য করা যায় যা আধুনিক বুননের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সহায়ক হয়ে উঠেছে।

'ঠাকুরমার ঝুলি'র (১৯০৭) এই সাফল্যের আড়ালে রয়েছে দক্ষিণারঞ্জনের জাদুকরি গদ্যভাষার আধুনিক বুনন। গল্প-বুননে তাঁর প্রশ্নাতীত নৈপুণ্য। প্রতিটি গল্প কথকতার ভঙ্গিতে রচিত। পাঠকের মনে হবে যেন, পাশে বসে কেউ গল্প বলে চলেছেন। 'মুখের কথাকে ছাপার অক্ষরে' তুলে ধরা আপাতভাবে সহজ মনে হলেও আসলে তা কিন্তু সহজ নয়। সহজ কথা বলা যায় না সহজে। 'কেতাবি ভাষা'য় আর যাইহোক, রূপকথার গল্প লেখা সম্ভব নয়। দক্ষিণারঞ্জন দুরূহ কাজটি সম্পাদন করেছেন অত্যন্ত সাবলীলভাবে, সূক্ষ্ম দক্ষতায়। দক্ষিণারঞ্জনের এই সাফল্য রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছিল। দক্ষিণারঞ্জনের গল্প কতখানি মুগ্ধ করেছিল, তা বোঝা যায় তাঁর এই মন্তব্যে 'আমি হইলে তো এ কাজে সাহসই করিতাম না'।

সাধু গদ্যভাষায় দক্ষিণারঞ্জনের হাতে স্বাদু হয়ে ওঠে। গদ্যের মাঝে ছন্দ-মিল, পদ্যের অনুপ্রবেশ বড়ই শ্রুতিসুখকর। শব্দ-ব্যবহারে দক্ষিণারঞ্জন সমান সচেতন। অনুকার শব্দ, শব্দদ্বৈত ও ধন্যাত্মক শব্দের ব্যবহারে তাঁর গদ্যভাষায় এসেছে এক স্বতন্ত্র মাধুর্য। শব্দের পৌনঃপুনিকতায় কখনো ছবি হয়ে ওঠে। লক্ষ করি 'যাইতে' শব্দটি বার চারেক ব্যবহার করে আশ্চর্য দক্ষতায় দক্ষিণারঞ্জন পথের দীর্ঘতা স্পষ্ট করে তোলেন।

দক্ষিণারঞ্জন আজও অননুকরণীয়, আকর্ষণীয়। তাঁর রূপকথার মায়াবী জগতের কাছে আমাদের বারবার ফিরে ফিরে যেতে হয়। রূপকথার নটে গাছ মুড়োয় না, গল্পও ফুরোয় না। ছোটরা সে-জগতের সন্ধান পেলে, তারাও যাবে, আনন্দে আপ্লুত হবে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

তথ্যসূত্র:

১. Levi Strauss, Claude. Structural Anthropology. (Translated Jacobson, Claire), 1963, New York: Basic Books Publishers. P. 160.
২. মজুমদার, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র। ঠাকুরমার ঝুলি। ১৩৭৯, কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স। পৃ. ৭৭।
৩. তদেব, পৃ.৭৭।
৪. তদেব, পৃ.৭৯।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. Prop, Vladimir. Morphology of Folktale (2nd Edition). 1968, Austine: University of Texas Press. Print.
২. De Saussure, Ferdinand. Course in General Linguistics. Eds: 1916, Bally, Charles and Albert Sechehaye, 1959). New York: The Philosophical Library. Print.
৩. Dev, Amiya and Das, Sisir Kumar. Comparative Literature: Theory and Practice. 1989 (Eds), Shimla: Indian Institute of Advanced Study. Print.
৪. হালদার, শিবপ্রসাদ। পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য। ১৯৯৩, কলকাতা: ফার্মা কে.এল. এম, মুদ্রণ।
৫. গুপ্ত, ক্ষেত্র। সংযোগের সন্ধানে লোকসংস্কৃতি। ১৯৯২, কলকাতা: পুস্তক বিপণি, মুদ্রণ।
৬. সেনগুপ্ত, চন্দ্রমল্লী। মিথ পুরাণের ভাঙাগড়া। ২০১৫, কলকাতা: পুস্তক বিপণি, মুদ্রণ।